ধর্মরাষ্ট্র সংস্থাপক শ্রীশ্রীকৃষ্ণ কেমন পূজা চান?

স্বামী যুক্তানন্দ

ধর্মরাষ্ট্র সংস্থাপক শ্রীশ্রীকৃষ্ণ কেমন পূজা চান?

সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুর দেশ ভারতবর্ষে যখন হিন্দুত্ববিরোধী শক্তির নূতনভাবে দ্রুত উত্থানের সুযোগ প্রবল, তখন প্রাচীন ঐতিহ্য অনুযায়ী সারা দেশ জুড়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পুণ্য আবির্ভাব-তিথি শ্রীশ্রীজন্মাষ্টমী সাড়ম্বরেই আবারও উদ্‌যাপিত হল। অবশ্য শুধু ভারতবর্ষেই নয়, বিশ্বের বহু স্থানেই ওই পুণ্য তিথি উদ্‌যাপিত হয়েছে। তবে এই প্রবন্ধ প্রকাশিত হওয়া পর্যন্ত দেশের বা বিশ্বের কোথাও ওই আবির্ভাব-তিথি উদ্‌যাপন করতে গিয়ে কোনও অনর্থ ঘটেছে কি-না, পূজার উদ্যোক্তাদের পুলিশের একান্ত ও অতিরিক্ত করুণা প্রয়োজন হয়েছে কি-না বা প্রশাসনের সতর্ক বার্তা উদ্যোক্তাদের সদা ব্যতিব্যস্ত করে তুলেছিল কি-না — তা এখনও কিছু শুনিনি। তবুও এমন আশঙ্কা করছি কেন? করছি এই কারণেই — হিন্দুরা রসগোল্লা কি-না! তাদের খুবলে খেতে, ঠোকর মেরে দেখতে, একটু জিভ বুলিয়ে নিতে বা গিলে খেতে অনেকেরই মনে সাধ জাগে, এমনকি তারা সচেষ্টও হয় — সে জন্যই! আর ওই একই কারণে হিন্দু উৎসবের আনন্দে মেতে উঠলেও লেখকের মতো অনেকেরই অন্তরে সংশয়ের মেঘ ঘনীভূত হয়ে ওঠে — পাছে লোকে কিছু করে, পাছে কোন অঘটন ঘটে—এমন আশঙ্কায়।

যাহোক, সব আশঙ্কা, সব সংশয়কে উপেক্ষা করেও বা প্রয়োজনে তার মুখোমুখী হয়েও কিন্তু হিন্দু যুগ যুগ ধরে সেই কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ং-এর জন্মতিথি পালন করে চলেছে, সেখানে কোন খামতি নেই। এবারও সেভাবেই হয়তো ওই দিনে অনেকে কৃষ্ণরূপী গোপালকে খুব করে নাড়ু খাইয়েছেন। অনেকে হয়তো ননীচোরার ননী বড় প্রিয় মনে করে হাঁড়ি হাঁড়ি ননী থরে থরে সাজিয়েছেন—তাঁর খাওয়ার জন্য। বা ঘরের শিকেয় হাঁড়ি ভর্তি করে ননী ঝুলিয়ে রেখেছেন—ননীচোরা এসে ননী চুরি করবেন, আর তাঁরাও তাঁকে ভক্তির বাঁধনে শক্ত করে আপন ঘরে চিরতরে বেঁধে রাখবেন। অনেকে হয়তো কোন কোন বালক-বালিকাকে কৃষ্ণ ও গোপিনী সাজিয়ে ব্রজলীলা উপভোগ করলেন। কেউ হয়তো সারা রাত কান পেতে রইলেন—যদি যমুনা পুলিনে বংশীধারী তাঁর মুরলী বাজান, তবে সেই বংশীধ্বনি শুনে তিনি ছুটে যাবেন সেখানে। আর শ্যামদর্শনে ও শ্যামের সঙ্গে একাত্ম হয়ে জীবনটি ধন্য কৃত-কৃতার্থ করবেন। অনেকেই সারারাত প্রাণভরে শুনলেন কীর্তনিয়ার কণ্ঠে—"মরিব মরিব সখী নিশ্চয়ই মরিব, কানু হেন প্রাণধন কারে দিয়ে যাব!" ... ইত্যাদি প্রেমমধুর পালাকীর্তন। এভাবে কেউ হয়তো গোষ্ঠবিহারী শ্রীকৃষ্ণ, রাধা প্রাণধন শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতি নিয়ে কত আয়োজন করে জন্মাষ্টমীর মহাপবিত্র দিনটি কাটিয়ে দিলেন। অথচ গোপাল থালায় সাজানো নাড়ুর একটিও খেলেন কী খেলেন না, ননী চুরি করলেন কি করলেন না, নকল কৃষ্ণ-গোপিনীদের খেলা দেখে দুধের সাধ ঘোলে মিটলেও আসল কৃষ্ণ বহুদূরেই রইলেন, না ধরা দিলেন, যাঁর জন্য এত উদ্যোগ আয়োজন দেখে তিনি প্রসন্ন হলেন, গম্ভীর হলেন বা হাসলেন, না তিথির ওই মহামাহেন্দ্রক্ষণে ভগবানের বাঁশী বাজল কি বাজল না, তিনি গোষ্ঠে গেলেন বা গোষ্ঠ থেকে ফিরে এলেন কি এলেন না বা রাধার সঙ্গে বিরহ বা মিলন কোন কিছুই লীলাও হল কি হল না — এসব প্রশ্নের সদুত্তর দিতে পারেন ওই পূজারীরাই। হলে তো খুবই আনন্দের কথা। তাঁরা তো মহাভাগ্যবান! তবে হয়তো এমনও হতে পারে যে সেই শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী বৈকুণ্ঠে বসে এসব আয়োজন দেখে স্বামী বেদানন্দজীর ভাষায় বলছেন—

"আমি কৃষ্ণ—সুদর্শন-ধারী!
নহি আমি বনমালী গোপীকা-রমণ,
নহি আমি রাধিকার মদনমোহন,
শিখি-পাখা-ধারী!
অঘ-বক-কেশী-ব্যোম-কালীয়দমন,
কংস-কুবলয়-মুষ্টি-চানুর-মর্দ্দন,
শাল্ব-শিশুপাল-কালযবন নিধন,
শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী—
আমি নারায়ণ!"

অবশ্যই বিস্ময়ের বিষয়, যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জীবনের শুরু মথুরার কংস কারাগার, আর শেষ দ্বারকায় — সেই কৃষ্ণের বাল্যলীলার মাত্র কয়েকটি লীলা নিয়েই বিশ্বব্যাপী অধিকাংশ কৃষ্ণভক্ত জন্মাষ্টমী তিথিটি সাড়ম্বরে কাটিয়ে দিলেন। আর তাঁর বাকী যে দীর্ঘ জীবন তা অধিকাংশের কাছে রয়ে গেল অনালোচিতই। যেন সেগুলি কিছুই নয়। বা তিনি যেন অন্য কৃষ্ণ। সে-সব লীলা নিয়ে তাঁদের ভাবনা নেই, চিন্তা নেই, শিক্ষা ও প্রেরণা লাভের যেন কোন সুযোগ নেই। এমনকি বৃন্দাবনে শ্রীভগবান যে স্বল্প কয়েকটি বছর ছিলেন, সেখানেও তাঁর বহু বীর্যপ্রদ লীলা সংঘটিত হয়েছে—সে নিয়েও কি তাঁদের কোন চিন্তা আছে? জানি না আছে কি-না? কিন্তু ওইভাবে ভগবানের যে জন্ম-জয়ন্তী পালন, তাঁর স্মরণ-মনন- নিদিধ্যাসন তা-কি অসম্পূর্ণ নয়? তাই তো মনে হয় শ্রীভগবান ওই অসম্পূর্ণ জন্মতিথি উদ্‌যাপনে পরিতৃপ্ত বা পরিতুষ্ট হন না। হন না বলেই তো—

বর্ষে বর্ষে হর্ষ ভরে করি জন্মাষ্টমী উদ্‌যাপন।
তবুও দুর্গত হিন্দুর অশেষ দুঃখ না হয় নিবারণ।।

প্রশ্ন হতে পারে—ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সমগ্র জীবন কি ওই মাত্র কয়েকটি লীলা নিয়েই? যাঁরা শাস্ত্র পড়েন, শাস্ত্র শুনেন, শাস্ত্র বুঝেন তাঁরা সকলেই জানেন, মানেন ও বলেন—ওই ঘটনাগুলি বিরাট পুরুষ শ্রীকৃষ্ণের বিরাট জীবনের বহু ঘটনার মধ্যে অতি খণ্ড, অতি ক্ষুদ্র কয়েকটি ঘটনা মাত্র, যা দিয়ে তাঁর সহস্রভাগ জীবনের একটি ভাগও প্রকাশিত হয় কি-না সন্দেহ।

হে কৃষ্ণভক্ত, শ্রীভগবানের পরিপূর্ণ জীবনটি তো এরকমই কি-না চিন্তা করে দেখুন—

পিতা উগ্রসেনকে বন্দি করে বলবান ও কূটবুদ্ধি পরায়ণ কংস মথুরার সিংহাসন অধিকার করেছে। উগ্রসেনের যারা সমর্থক পরন্তু যদুবংশের নেতৃস্থানীয় লোকেদেরও স্থান হয়েছে কারাগারে। তাদের মধ্যে বসুদেবও অন্যতম। কংস ভগিনী দেবকীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ দেয় তাঁকে নিজের দলে আনার জন্য। কিন্তু বিবাহের পর যখন জ্যোতিষিরা বললেন যে দেবকীর অষ্টম গর্ভজাত সন্তানই হবে তার মৃত্যুর কারণ, তখন তাদের আর কোন ক্ষমা না করে উভয়কে কারাগারে বন্দি করে অত্যাচার করা হতে লাগল। পরে যখন বসুদেব প্রতিশ্রুতি দেন — দেবকীর গর্ভজাত সন্তানদের তিনি কংসের হাতে তুলে দেবেন তখন তাদের উপরে কংসের অত্যাচার বন্ধ হয়। কিন্তু তাঁরা বন্দীমুক্ত হলেন না। এবং কথামত সন্তানগুলি একে একে অসুর কংসের হাতে তুলে দিতে থাকলেন। কংসও তাদের হত্যা করে মৃত্যুভয় থেকে নিশ্চিন্ত হওয়ার চেষ্টা করতে থাকল।

অত্যাচারী কংসের অত্যাচার যখন শুধুমাত্র বাসুদেব দেবকীই নয়, পরন্তু সমগ্র মথুরা রাজ্যেই ছড়িয়ে পড়েছিল, সকলেই যখন নিরুপায় হয়ে শ্রীভগবানের কাছে একান্তভাবেই আর্তি জানাচ্ছিল, তখনই শ্রীমধুসূদন নারায়ণ দেবকীর কোল আলো করে শ্রীকৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হলেন।

বসুদেব সেই সন্তানকে রক্ষার জন্য গোপজাতির রাজা নন্দের বাড়ীতে তাঁকে রেখে আসেন। আর সেখান থেকে ফেরার পথে একটি সদ্যোজাত কন্যাকে নিয়ে এসে তুলে দেন কংসের হাতে। কিন্তু জ্যোতিষিদের মত বা দৈববাণী দেবকীর অষ্টম গর্ভজাত সন্তান নিরাপদে গোকুলে বাড়ছে। তখন থেকেই শুরু হল — মথুরার সব শিশুকে হত্যা করার উদ্যোগ। গোপরাজ নন্দও শ্রীকৃষ্ণকে রক্ষায় গোকুল ত্যাগ করে চলে গেলেন বৃন্দাবনে — শিশুহন্তা কংসের ভয়ে।

কিন্তু বৃন্দাবনে গেলেই কি কংসের দুষ্টচক্র থেকে নন্দরাজা শ্রীকৃষ্ণকে নিশ্চিন্তে রক্ষা করতে পেরেছিলেন? পারেননি। তাই দেখা যায় যখন শ্রীকৃষ্ণ শিশু থেকে ক্রমশঃ বালক, বালক থেকে ক্রমশঃ তরুণ বয়সে পদার্পণ করছেন, বন্ধু গোপবালকদের সঙ্গে খেলাধূলা করে বড় হচ্ছেন, গোরু চরাচ্ছেন আর সেই সুযোগে কংস পূতনা, তৃণাবর্ত, শকটাসুর, অঘাসুর, বকাসুর ব্যোমাসুর, মেড্রাসুর প্রভৃতি গুপ্তচরদের পাঠিয়ে নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণকে মারার চেষ্টা করে চলেছে। কিন্তু প্রত্যেকেই শ্রীকৃষ্ণ, বলরাম ও গোপবালকদের হাতে নিহত হয়। সেদিন যখন কংসের পাঠানো সসৈন্য কেশী বৃন্দাবন আক্রমণ করে, তখন শ্রীকৃষ্ণের কৌশলের কাছে তারা পরাজিত হয়েছে। যুদ্ধে মেড্রাসুরকে নিহত করে তার রক্তে শ্রীকৃষ্ণ হোলি খেলা করেছেন। আর কেশী দৈত্যকে নিহত করে শারদীয়া পূর্ণিমার রাত্রে শ্রীকৃষ্ণ এক বিরাট রাসনৃত্যোৎসব করেছিলেন; যার ফলে ক্রমাগত যুদ্ধে গোপগণের

ও বৃন্দাবন রাজ্যের ক্ষয়ক্ষতি ভুলে গোপগণ নিজেদের রাজ্যরক্ষা ও শত্রুবধের দুর্জয় সঙ্কল্পে উদ্বুদ্ধ হয় এবং একই সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের প্রতিও তাদের বিশ্বাস ও আনুগত্য অবিচল থাকে। এমন কথাই বলেছেন সঙ্ঘের বিদগ্ধ সাহিত্যিক স্বামী বেদানন্দজী তাঁর হিন্দুধর্ম-সাম্রাজ্য-সংগঠক শ্রীকৃষ্ণ পুস্তিকায়। তিনি আরও বলেছেন—নৃশংস কংস কেশীর পর পাঠায় কালীয়কে। সেই কালীয় নাগ জলে বিষ মিশিয়ে বহু গোপকে হত্যা করে। কিন্তু সেই কালীয়ও শ্রীকৃষ্ণের কূট-কৌশলের কাছে হার মেনে শ্রীকৃষ্ণচরণে আশ্রয় নিয়ে নিজের প্রাণ রক্ষা করে।

গোবর্দ্ধন পর্বতে গোপজাতির আরাধ্যা দেবী কাত্যায়নীর পীঠস্থান। সেখানে তারা বৎসরের নির্দিষ্ট দিনে মিলিত হয়ে দেবীর পূজা ও উৎসব করে। কংসের মন্ত্রণায় পার্শ্ববর্তী সামন্ত রাজা ইন্দ্র গোপগণকে ধ্বংস করতে চাইলে শ্রীকৃষ্ণের নেতৃত্বে ইন্দ্ররাজার সঙ্গে সাতদিন যাবৎ যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে ইন্দ্ররাজের পরাজয় ও মৃত্যু ঘটে। এ ঘটনাকেই ভাগবতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের গোবর্দ্ধন ধারণ বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

কংসের চরেরা যতই শ্রীকৃষ্ণের কৌশল ও শক্তিতে পরাভূত হচ্ছে, ততই দিন দিন আরও বেশিভাবে ক্ষিপ্ত কংসের অত্যাচার বাড়ছে জনসাধারণের উপর। আর অন্যদিকে তার পরাজয়ের সংবাদ জনগণের কানে পৌঁছালে তারাও শ্রীকৃষ্ণের আসার অপেক্ষায় অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতে থাকে। তাদেরও প্রত্যাশা স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণই এসে এই অত্যাচারীর কবল থেকে তাদের ধন-মান-প্রাণ রক্ষা করবেন। তাই দেখা গেল বৃন্দাবন থেকে শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় এলে ওই মানুষগুলি স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাঁকে অভ্যর্থনা জানিয়েছিল। মথুরায় শ্রীকৃষ্ণের হাতে কুবলয় হাতী, চাণুর প্রভৃতি সেনাপতি থেকে কংস পর্যন্ত সকলেই নিহত হল। এতো গেল বৃন্দাবন ও মথুরার শ্রীকৃষ্ণের জীবনীর উল্লেখযোগ্য কিছু লীলা-কথা। এরপরও পাওয়া যায়—

কংসের চেয়ে বহুগুণে বলবান ও পরাক্রমশালী জরাসন্ধ, শিশুপাল, দন্তবক্র, শাল্বদৈত্য, পৌণ্ড্রবাসুদেব প্রভৃতি অসংখ্য অসুর, রাক্ষস, দৈত্য ও দুষ্ট ক্ষত্রিয় রাজাকে তিনি ধ্বংস করেছিলেন। নরকাসুর ষোল হাজার দেবকন্যাকে হরণ করে বন্দী করে রেখেছিল। জরাসন্ধের আরও উদ্দেশ্য ছিল একশ আটজন রাজার মুণ্ড দিয়ে রাজমেধ যজ্ঞ করবে। ওই উদ্দেশ্যে সে আটানব্বই জন রাজাকে বন্দী করেও রেখেছিল। বাকী ছিল আরও দশজন রাজাকে সংগ্রহ করার কাজটুকু। কিন্তু তার আগেই শ্রীকৃষ্ণ যেমন ওই নরপিশাচ নরকাসুরের হাত থেকে ষোল হাজার দেবকন্যাকে মুক্ত করেন, তেমনই ওই রাক্ষস মনোবৃত্তি সম্পন্ন জরাসন্ধের কবল থেকে বন্দী আটানব্বই জন রাজাকেও মুক্ত করেন। এ সবই ছিল তাঁর ধর্ম-সাম্রাজ্য গঠন-লীলা। ওই কাজে তাঁর অভিনব সামরিক বিদ্যায় সুপণ্ডিত, দুর্জয়, আত্মঘাতী বা সংশপ্তক নারায়ণী সেনাবাহিনী ছিল একান্ত সহযোগী। ওই সেনাবাহিনী এমনই পরাক্রমী ছিল যে অর্জুন ছাড়া তাদের কেউ পরাজিত ও ধ্বংস করতে পারেনি। এরপর ধর্ম-সাম্রাজ্য গঠনের প্রয়োজনে শ্রীকৃষ্ণের যে বিরাট ভূমিকা তার কাহিনী তো সমগ্র মহাভারত জুড়েই রয়েছে।

সুতরাং আমরা কি করে মেনে নিই — নাড়ু গোপাল, ননী-মাখন চোর, বস্ত্রহরণকারী প্রভৃতি শ্রীকৃষ্ণের অতি সাধারণ লীলাকথাকেই সবকিছু বলে? ভগবান কি বসে বসে লাড্ডু খাওয়ার জন্য, ননী-মাখন চুরি করার জন্য, বস্ত্রহরণ করার জন্য, মাঠে গোরু চরানোর জন্য বা গোপিনীদের নিয়ে লীলা করার জন্যই জগতে আসেন? ভগবান কি তাই বলেছেন?

শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতায় স্বয়ং শ্রীভগবান কৃষ্ণ — এই জন্মাষ্টমীর মহাপুণ্য তিথিতে যাঁকে আমরা আমাদের খুশীমত সাজিয়ে পূজা করলাম, ভোগ নিবেদন করলাম, তাঁর কথা আলোচনা করলাম, কান পেতে শুনলাম তিনি নিজে এই জগতে তাঁর আসার কি কারণ বলেছেন, তাঁর অমৃত উপদেশ-গ্রন্থ শ্রীশ্রীগীতার পাতা উল্টে দেখলেই তো তা পাওয়া যায়।

যখন ধর্ম গ্লানিযুক্ত হয়, অধর্মের অভ্যুত্থান ঘটে, তখন ধর্মকে গ্লানিমুক্ত করতে জগতে এসে থাকি বা অবতীর্ণ হই। অবতীর্ণ হয়ে তিনি কি করেন? সে-কথা শ্রীভগবান পরের শ্লোকেই বলেছেন — তিনি করেন সাধুগণের পরিত্রাণ, দুষ্কৃতকারী অধর্মাচারীদের বিনাশ এবং ধর্মের পুনঃ সংস্থাপন।

যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্।।
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।। ৪/৭-৮

কৈ এখানে ওই সব লীলা করার কথা তো নেই। বরং ওই সবগুলি বাদ দিয়ে শ্রীভগবান বৃন্দাবনে, মথুরায় বা পরবর্তীকালে কুরুক্ষেত্রকেন্দ্রিক ঘটনায় যে ভূমিকা নিয়েছেন সেকথাই তিনি নিজমুখে বলেছেন।

সেখানেও তিনি যেন বেদানন্দজীর ভাষায় বলছেন—

'নহি আমি নন্দের নন্দন!
নহি আমি যশোদারঞ্জন!
নহি আমি নৃত্যশীল মুরলী বদন!
আমাকে চিনিস নাই পাঞ্চজন্য নাদে?
আমাকে হেরিস নাই গাণ্ডীবীর সাথে?
রাজসূয় মহাযজ্ঞে লক্ষ নরপতি
ভক্তি অর্ঘ্যে পূজিলা আমায়,—
সেই স্মৃতি ডুবালি কোথায়?'

এখানে বলা বোধহয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না — ভগবান যদি লাড্ডু খাওয়া, ননী চুরি করা প্রভৃতি উদ্দেশ্য নিয়েই জগতে আসতেন, তাহলে তাঁকে নিয়ে কি কংসের অত ভয়ের কোন প্রয়োজন ছিল? না প্রিয় ভগিনী দেবকীকে সেজন্য বন্দীশালায় বন্দী করে রাখতো? না বসুদেব দেবকীর সন্তানগুলিকে — আপন ভাগিনেয়দেরকে একটি একটি করে হত্যা করতো? বরং কংস ঝুড়ি ঝুড়ি লাড্ডু, শত শত হাঁড়ি ননী-মাখনের মাঝে বসিয়ে রাখত শ্রীকৃষ্ণকে বা অন্যান্য ক্ষেত্রেও সেই ব্যবস্থাই করত না কি?

জানি না ওই পথে আরাধনায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আজ পর্যন্ত কতজনের উপর পরিতুষ্ট হয়েছেন। হয়ে থাকলে তাঁরা অবশ্যই ভাগ্যবান! কিন্তু যতদূর মনে হয় ভগবান নিজে যে যে আচরণ করেন—তা অন্যদেরও আচরণ করার জন্যই শিক্ষা দেন। সেজন্যই তিনি গোপবালকদের নিয়ে দল গঠন করেছিলেন। নারায়ণী সেনা নামে ভয়ানক সেনাবাহিনী গঠন করেছেন। নিজ হাতে এক এক করে অসুরদের করেছেন ধ্বংস। তাঁর নিজ উপদেশ-গ্রন্থ শ্রীশ্রীগীতায় বার বার বলেছেন—'ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ;' 'স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্মো ভয়াবহঃ', 'ধর্ম্যাদ্ধি যুদ্ধাচ্ছ্রেয়োঽন্যৎ ক্ষত্রিয়স্য ন বিদ্যতে'; 'যুধ্যস্ব বিগতজ্বরঃ', 'হতো বা প্রাপ্স্যসি স্বর্গং জিত্বা বা ভোক্ষ্যসে মহীম্', 'তস্মাদুত্তিষ্ঠ কৌন্তেয় যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়ঃ' ইত্যাদি বীর্যবাণী। বলেছেন — সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।

আমার শরণাপন্ন হও যা করতে বলি, তাই কর।

তাঁর প্রবর্তিত ও প্রদর্শিত পথে না চললে তাঁর উপাসনাকারী যে যথাযথভাবে তাঁর করুণা লাভ করতে পারেন না, এমন একটি ঘটনার কথা এখানে উল্লেখ করছি।

সঙ্ঘ-প্রতিষ্ঠাতা যুগাচার্য স্বামী প্রণবানন্দজী তখনও স্থূল-শরীরে বর্তমান। জন্মাষ্টমী দিনেরই ঘটনা। তিনি উপস্থিত রয়েছেন সঙ্ঘের বালীগঞ্জস্থিত প্রধান কার্যালয়ে। রাত তখন প্রায় এগারোটা বাজে। কলকাতার বস্তিবাসী কয়েকজন উৎকলী শ্রমিক—শ্রীশ্রীসঙ্ঘনেতার শ্রীচরণে শরণাগত। তারা বিপদে পড়েছে, উদ্ধারের প্রার্থনা জানাতেই এসেছে তাঁর কাছে। বিপদটা এরকমই — প্রায় দু'শ ভক্ত মিলিত হয়ে তারা যখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও প্রভু জগন্নাথদেবের শ্রীমূর্তির সামনে রাত্রেবেলায় মনের আনন্দে ভজন-কীর্তন করছিল, তখন বিরক্তি সৃষ্টি ও ঘুমে ব্যাঘাত ঘটার কারণ দেখিয়ে অন্য ধর্মের দু'জন প্রতিবেশী এসে তাদের কীর্তন বন্ধ করতে বলে। কিন্তু তারা তা বন্ধ করতে স্বীকার না করায় ওই দুই দুর্বৃত্ত তাদের মারধোর করে, পূজার উপকরণগুলি অপবিত্র করে এবং শ্রীকৃষ্ণ ও জগন্নাথদেবের মূর্তি দু'টি ভেঙ্গে চুরমার করে দিয়ে সগর্বে চলে যায়। ভক্তের

সংখ্যা অত বেশি সংখ্যক থাকা সত্ত্বেও কারও প্রতিবাদ করার সাহস পর্যন্ত হয়নি। কারণ ওই দুই গুণ্ডা এক দুর্ধর্ষ বিশেষ সম্প্রদায়ের লোক। টুঁ শব্দটি করলে দলে ভারী হয়ে এসে আবার তাদের উপর প্রবল আক্রমণ হতে পারে — এমন আশঙ্কায়।

পাঠকের হয়তো মনে হতে পারে যে ঘটনার কথা বললাম, তা আজ থেকে ৬০–৭০ বছরের আগের কথা। সুতরাং আজ তা অচল। কিন্তু একথা অবশ্যই বলা যায় — ওই জাতীয় ঘটনা তার পরে বহু জায়গায় বহুবার যেমন ঘটেছে, তেমনই আজও যে ঘটে না — তা মোটেই নয়। বরং খুঁজলে অনেক পাওয়া যেতেই পারে।

যাহোক, তাদের কথা শুনে সেদিন শ্রীশ্রীসঙ্ঘনেতা বলেছিলেন, "তোমাদের পূজার বেদীতে নিশ্চয়ই দেবতা ছিলেন না। তোমরা নিজেদের ক্লৈব্য-দৌর্বল্য ও অকর্ম্মণ্যতাকেই দেবতার আসনে বসিয়ে পূজা করেছিলে। তোমরা অন্ততঃ দু'শ মানুষ; দুর্বৃত্তরা মাত্র দু'জন। যদি অন্ততঃ একটা দুর্বৃত্তেরও মুণ্ডপাত করে আসতে, তবে বুঝতাম তোমরা ঠিক ঠিক ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পূজারী।"

সেদিন আচার্যদেবের শ্রীমুখ থেকে ওই ঘটনায় প্রতীকার প্রার্থীদের কাছে তাঁর যে বক্তব্যের প্রকাশ হয়েছিল—সেটিই প্রকৃতপক্ষে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কথা। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্থূলশরীরের থাকাকালে তাঁর কাছে শত্রু মনোভাবাপন্ন, অনিষ্টকারী, অহিতকারী মনোভাবাপন্ন যখনই যে কেউ এসেছে কাউকেই তিনি ক্ষমা করেনি। উচিত শাস্তি ও শিক্ষা দিয়েছেন। সে ওই মাতৃস্নেহমূর্তি পূতনাই হোক, আর অঘাসুর, বকাসুর, কালীয়, কংস, শিশুপাল বা যেই হোক না কেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ধর্ম — বীরের ধর্ম, সাহসীর ধর্ম, পুরুষত্বের ধর্ম; সেখানে ক্লীবতা, কাপুরুষতা, দুর্বলতা, ভীরুতার কোন স্থান নেই। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সমগ্র জীবনব্যাপী এই যে বীর্যদীপ্ত কর্মলীলা, সেটিই তাঁর প্রকৃত পরিচয়। সেখানেই তিনি শ্রেষ্ঠ আচার্য, শ্রেষ্ঠ অবতার, তিনি পুরুষোত্তম, তিনি ধর্মরাষ্ট্র সংস্থাপক, তিনি কৃষ্ণস্তু স্বয়ং ভগবান।

এক্ষেত্রে স্বামীজী কাব্যছন্দে ভগবানের সে-কথাই যেন বলছেন—

"শুনিস্‌নি গীতা-কণ্ঠে মোর মর্মবাণী?
যুদ্ধ কর, যুদ্ধ কর, তুচ্ছ কর জয় পরাজয়!
চূর্ণ কর ক্লীবতা দীনতা, বীরত্বেই মহত্ত্ব নিশ্চয়!
ওঠো জাগো জয় করো, করো যশো লাভ
শত্রু ধ্বংস করি করো সাম্রাজ্য-সম্ভোগ!
— এই বজ্রবাণী মোর হারালি কোথায়?"

অথচ আমরা তাঁর সেই যথার্থ স্বরূপকে ভুলে, তাঁর কথা না বলে, না চিন্তা করে, না প্রচার করে, তা থেকে না শিক্ষা নিয়ে, সেই আদর্শে নিজেদের জীবনকে না গঠিত করে কোথায় তিনি ননী চুরি করে খেলেন বা খেলেন কি-না, কোথায় তিনি গোপী-লীলা করলেন কি করলেন না। এসব কল্পনা নিয়েই মেতে আছি। আর তাতেই আমাদের আনন্দ। অথচ ওই সব লীলার যথার্থ রহস্যও আমাদের অনুভবের চেষ্টা নেই।

শাস্ত্রে নববিধা ভক্তির কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ অর্চন, বন্দন, দাস্য, সেবন, স্মরণ, কীর্তন, শ্রবণ, সখ্য ও আত্মনিবেদন—এইগুলি দিয়ে বা এর এক অথবা একাধিক উপায়ে শ্রীভগবানের করুণা ও সান্নিধ্য লাভের মতকে শাস্ত্র সমর্থন করেছেন। এর দ্বারা অবশ্যই সাধকের আধ্যাত্মিক জীবনে উন্নতি বা ঈশ্বরপ্রাপ্তির পথ সহজ ও সুগম হবে। সেই কথানুযায়ী বলতে হয়—যাঁরা শ্রীভগবানের নাড়ু গোপাল মূর্তিতে নাড়ু ভোগ দিয়ে, বা তাঁকে ননী খাইয়ে পরিতৃপ্ত করতে চান, বিনিময়ে তাঁর করুণা পেতে চান তা নিশ্চয় বিফলে যাওয়ার কথা নয়। তবে শ্রীভগবান সম্বন্ধে অন্যান্য লঘুলীলা কাহিনীগুলি অবলম্বন করে চলায় তাঁরা কতখানি সুফল পাবেন, সে নিয়ে সংশয় থেকেই যায়।

যা হোক ওই ভাবেও শ্রীভগবানের আরাধনায় বা তাঁর জন্মতিথি পালনের মধ্য দিয়ে প্রাপ্তি যাই হোক বা না হোক না কেন তা বলে আমরা কি আমাদের শরীর, আমরা যে গৃহে বসবাস করি সেটি, আমাদের আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী, গ্রাম বা নগরবাসী, সমাজ বা দেশকে উপেক্ষা

করতে পারি? তার কি কোন গুরুত্ব নেই। অবশ্যই আছে। এবং তাই সর্বাধিক। সেগুলির প্রয়োজন ও সংরক্ষণের কথা কি ভুলতে পারি? পারি না। কারণ, আমার আত্মিক কল্যাণে চাই সুস্থ শরীর, সেই শরীরের সুরক্ষায় আবশ্যক ভাল বাড়ী, ভাল খাওয়ার। সুরক্ষিত হওয়া চাই আমার আত্মীয় পরিজন। তারা সুস্থ না থাকলে আমারও অসুবিধা হবে। আত্মীয়দের সঙ্গেই প্রতিবেশীরা, পাড়ার লোকরাও সুস্থ থাকলে আমার বিপদে আপদে সাহায্য হবে। তেমনভাবেই সমাজ ও রাষ্ট্র সুরক্ষিত হলে আমরা সকলেই নিশ্চিত। এ চাহিদাগুলি যেমন বাস্তব, তেমনই তা পাওয়ার উপায়ও বাস্তব। এখানে ভাবের দোহাই দেওয়ার কোনও উপায় নেই। তা যদি না থাকে তবে সেজন্য আমাদের সার্বিক রক্ষার একমাত্র উপায় শ্রীভগবানের প্রদর্শিত পথই আমাদের বাঁচা ও বাড়ার পথ; যা আমাদের অবশ্যই অনুসরণ করতে হবে। প্রয়োজনে তা অনুকরণও করতে হবে। অন্যথায় আমরা ব্যক্তিগতভাবে তো বটেই, এমনকি সমষ্টিগতভাবেও বিনষ্ট যে হবোই— একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

ওই প্রয়োজনেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পূজারাধনার নামে হাজার বছরব্যাপী যে প্রহসন চলছে, সেই প্রহসন ও ভ্রান্তি দূর করতে উদ্যোগী হলেন নবযুগের আচার্য যুগাচার্য স্বামী প্রণবানন্দজী মহারাজ। তিনি শ্রীভগবান শ্রীকৃষ্ণের উপাসনাকারী হিন্দু জনসাধারণের সামনে এক ইঙ্গিতবহ প্রশ্ন তুলে ধরলেন—"শ্রীকৃষ্ণের হাতে সুদর্শন, তাহা দেখিয়া তুমি কি ভাবনা ভাবিবে?" যারা মুরলীধারী শ্রীকৃষ্ণকেই একমাত্র যথার্থ শ্রীকৃষ্ণ বলেই মনে করেন, চক্রধারী শ্রীকৃষ্ণ বহুযুগ তাঁদের চিন্তা-কল্পনা, ধ্যান-ধারণা ও ব্যাখ্যা কীর্ত্তনের অতীত বলেই বলেছেন—সঙ্ঘের অন্যতম বিদগ্ধ সাধক স্বামী নির্মলানন্দজী। এর জন্যই ধর্মভিত্তিতে অখণ্ড শক্তিশালী হিন্দুজাতি গঠনের পুরোধা শ্রীশ্রীযুগাচার্য শ্রীকৃষ্ণের বীর্যঘন মূর্তির দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে হিন্দু জাতির সহস্রাব্দের ক্লৈব্য দৌর্বল্য ও জাড্য-জড়তার উপর যবনিকাপাত করতে শুধু কথায় নয়, কাজেও তিনি উদ্যোগ নিয়েছিলেন। এই প্রয়োজনেই তিনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্মতিথি 'জন্মাষ্টমী'তে বিশেষ সম্মেলনের আয়োজন করলেন। সেই সম্মেলনে দেশের শিক্ষিত জ্ঞানী-গুণীজন ও সঙ্ঘ-সন্ন্যাসীরা বক্তব্যের মধ্য দিয়ে দেশবাসীকে বুঝানোর চেষ্টা করলেন মহানায়ক শ্রীকৃষ্ণের প্রকৃত জীবনাদর্শ। বক্তারা শোনালেন বসুদেব-দেবকী নন্দন শ্রীকৃষ্ণ ননী চুরি, বসন চুরি, গোপীলীলাতেই মত্ত ছিলেন এমন নয়, তিনি কংস জরাসন্ধ-শাল্ব-শিশুপাল প্রমুখের শাস্তিদাতা বা নিহন্তা। তিনি পার্থসারথিরূপে কুরুক্ষেত্রের সমরাঙ্গণে অধর্মের সমূলে উচ্ছেদ করে ধর্মের বিজয় ঘোষণা করতেই অর্জুনকে যুদ্ধে উদ্বুদ্ধ করেছেন। অধর্মাচারী কাউকেই তিনি কোনওদিনই কোনওভাবে ক্ষমা করেননি। সেই বীর্যবান ও দুষ্ট দুরাচারীর শাস্তিদাতা এবং শক্তি সাধনার উদ্‌গাতা সম্পর্কে কীর্তনীয়াদের লীলাকীর্তন যে হিন্দুকে দুর্বল করেছে, তা নিয়ে সন্দেহ নেই। তার ফলেই হিন্দু সংখ্যায় বেশী হয়েও সংখ্যালঘুদের হাতে দিনের পর দিন মার খেয়েছে। মার দিতে পারেনি।

নাড়ু গোপাল, ননীচোরা কৃষ্ণ প্রভৃতি শ্রীভগবানের ছবির স্থলে শ্রীশ্রীআচার্যদেব প্রবর্তন করেন তাঁর বীর্যদৃপ্ত সুদর্শনধারী মূর্তি। যে মূর্তি দেখে বীর সাভারকরের মত হিন্দুনেতা বলেছিলেন — "This is a very noble Idea."

সেদিন শ্রীশ্রীযুগাচার্যের আহ্বানে যে সকল দেশবরেণ্য নেতৃবৃন্দ সঙ্ঘ আয়োজিত জন্মাষ্টমী সম্মেলনে উপস্থিত হয়ে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের বীর্যদীপ্ত অশুভ শক্তি বিনাশী কর্মলীলা সম্বন্ধে আলোচনা করেন, শ্রীকৃষ্ণ যে শুধু প্রেমের ঠাকুরই নন, পরন্তু তিনি রণেরও ঠাকুর একথা বুঝিয়ে হিন্দুকে শ্রীকৃষ্ণের সেই জীবন ও আদর্শ অনুসরণের জন্য যাঁরা আহ্বান জানান তন্মধ্যে — বিচারপতি শ্রীচারুচন্দ্র বিশ্বাস (সি.আই.ই), ধনকুবের শ্রীযুগলকিশোর বিড়লা, নিখিল ভারত হিন্দু মহাসভার সম্পাদক শ্রীপদ্মরাজ জৈন, লোকসভার সদস্য শ্রীমদন মোহন বর্মন, কংগ্রেস নেতা শ্রীসাতকড়িপতি রায়, ভারত-কেশরী ও বাংলার গৌরব ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, প্রবাসী পত্রিকার সম্পাদক শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, প্রসিদ্ধ হিন্দুনেতা শ্রী বি. সি. চ্যাটার্জী (ব্যারিস্টার), ব্যারিস্টার শ্রীনির্মল চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (প্রাক্তন স্পিকার শ্রীসোমনাথ চট্টোপাধ্যায়ের পিতা), শ্রী নরেন্দ্রনাথ দাস (এম. এল. এ) প্রমুখ। বাংলার প্রসিদ্ধ লাঠিয়াল শ্রীপুলিনবিহারী দাস ও তাঁর

অনুগামীরা সেদিন সম্মেলনের প্রাক্কালে লাঠিখেলা দেখিয়ে মানুষকে শক্তিসাধনা ও আত্মরক্ষায় প্রেরণা জোগান।

শ্রীশ্রীযুগাচার্য তাঁর বাণীতে বলেন — "শ্রীকৃষ্ণ হিন্দুধর্ম ও জাতীয়তার মূর্ত বিগ্রহ। তাঁর পূজায় জাতি দুর্ব্বল, ভীরু, শত্রুপরাভূত হতে পারে না। অত্যাচার ও অনাচারের প্রতিবাদ ও প্রতিকারের সঙ্কল্প ও উদ্যম নিয়ে হিন্দুকে ভীম বিক্রমে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের সম্মুখীন হতে হবে। তবেই হিন্দু বাঁচবে।"

তাই স্বামী বেদানন্দজী তাঁর কবিতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রেরণাতেই ভগবানের কথা লিখলেন—

"আমাকে পূজিতে চাহ?
লও তবে অস্ত্র সুদর্শন!
আমাকে তুষিতে চাহ?
ধর তবে গাণ্ডীব ভীষণ!
পূজার সঙ্কল্প মোর—
"শত্রু বিমর্দন, দিগ্বিজয়, সাম্রাজ্য স্থাপন"
এই পূজা করেছিল পাণ্ডব দুর্জয়।
শ্রেষ্ঠ পূজা করেছিল পার্থ ধনঞ্জয়।।"

অতীতে সুদর্শনধারী, কংসারি, অসুরবংশ ধ্বংসকারী শ্রীকৃষ্ণকে ত্যাগ করে ননীচোরা, বসনচোরা গোপিগণ পরিবৃতা বনমালী কৃষ্ণের ভজনা করে হিন্দুকে যে দুর্যোগে পড়তে হয়েছিল, আজ পুনরায় তেমনই হওয়ার সম্ভাবনা ফুরিয়ে যায়নি। বরং তেমন হওয়ার সম্ভাবনা আরও আরও বেশি ভাবে দেখা দিতে শুরু করেছে। সুতরাং সেই দুর্দিনে হিন্দুকে হিন্দু হয়েই বাঁচতে হলে, তার ধর্ম-সমাজ-সংস্কৃতিকে সঙ্কট থেকে মুক্ত করতে হলে স্বামী প্রণবানন্দজী নির্দেশিত ধর্ম-সংস্থাপনকারী, দুষ্টের বিনাশকারী ও শিষ্টের পালনকারী নারায়ণী সেনার নায়ক, সুদর্শনধারী ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করতে হবে।

সঙ্ঘকবি স্বামী নির্মলানন্দজীর ভাষায়—

"বনমালী কৃষ্ণ ত্যজি
কর ধ্যান পার্থসারথির
বাঁশি ত্যজি অসি দাও করে
দ্বিখণ্ডিত যাহে অরি শির।"

পুনরায় বলি — আমাদের প্রাণের ঠাকুর, হৃদয়ের দেবতা শ্রীশ্রীকৃষ্ণের যেরূপ যার যেমন ভাল লাগে তেমনভাবেই পূজা করুন। তাতে যার যা লাভ হয় হোক। কিন্তু আমাদের সত্যিকারের কল্যাণের পথ, যা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ করে দেখিয়েছেন, করতে বলেছেন — তা যেন আমরা ভুলে না যাই। আমরা যতখুশী ভগবানকে নাড়ুগোপাল, ননীচোরা বলি বা পূজা করি বা আমার মনের মত করে সাজাই না কেন — আমরা যেন মনে রাখি প্রয়োজনে এই নাড়ুগোপালই হাতে নিবেন সুদর্শন, হাতে নিবেন গদা, হাতে নিবেন ধনু। তিনি কোনও সময়ই অস্ত্রশূন্য নন, সততই অস্ত্রধারী। তাঁর বিষ্ণুরূপ, নারায়ণ রূপ, রামচন্দ্র-কৃষ্ণরূপ, নৃসিংহ-বরাহ রূপ তো তেমনই প্রমাণ করে। তবেই আমাদের ব্যক্তিগত জীবন-ধন-মান-পরিচয়-সমাজ- দেশ-ধর্ম-সংস্কৃতি-দেবতা-মন্দির-নারী সবই সুরক্ষিত থাকবে। অনন্তকাল ধরে শ্রীশ্রীজন্মাষ্টমী মহোৎসব আজ যেমনভাবে সাড়ম্বরে উদ্‌যাপিত করছি, তেমনভাবেই উদ্‌যাপিত করতে পারব। তাতে কোন বাধা হবে না। কিন্তু ধর্মরাষ্ট্র-সংস্থাপক শ্রীভগবানের কথা না শুনলে, তাঁর পথে না চললে ডুবতে হবে স্ব-খাত সলিলে।

স্বামী প্রদীপ্তানন্দ, ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ কর্তৃক প্রকাশিত।

প্রণামী — ২ টাকা মাত্র